প্রথম অধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তি পরিচয় সংক্ষেপ ও সাহিত্যকৃতি

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, অবিভক্ত বাংলার অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে। 'অর্ধেক জীবন' গ্রন্থে ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালে সারা পৃথিবীতে কিংবা সারা দেশে, কিংবা কলকাতা শহরে, এমনকী কাছাকাছি ঢাকা শহরেও কীসব ঘটনা ঘটছে তার কোনো রেশই আমগ্রাম বা মাইজপাড়ার মত গ্রামে পৌঁছোয় না। ইংরেজিতে যাকে বলে ব্যাক অফ বিয়ন্ড, এইসব গ্রামগুলির সেই অবস্থা।"[১] পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, মা মীরা দেবীর প্রথম সন্তান তিনি। পৈতৃক বাড়ি মাইজপাড়া গ্রাম। তাঁর অন্যান্য ভাই বোন অনিল, অশোক এবং কণিকা। ১৯৩৮ সালে শুরু

হয়েছিল তাঁদের উত্তর কলকাতার জীবনের সূত্রপাত। গ্রে স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। বাবা ছিলেন কলকাতার টাউন স্কুলের শিক্ষক। হতদরিদ্র জীবন যাপন ও আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রথম থেকেই তাঁর ছিল পরিপূর্ণ।

শৈশব জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে সুনীল লিখেছেন, "পয়সার বড় টানাটানি। আমার দরিদ্র স্কুল শিক্ষক বাবা প্রাণপণে, অতি পরিশ্রমে আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতেন ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু করার প্রশ্নই ছিল না। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দু-চার পয়সা আদায় করতাম। তখন লোকে কথায় কথায় বলত কলকাতা শহরে পথে পথে পয়সা ছড়ানো থাকে। এটা আংশিকভাবে আক্ষরিক সত্য ছিল। ধনী পরিবারে কেউ মারা গেলে তার শবযাত্রায় যেমন একদল লোক পেছনে পেছনে হরি বোল ধ্বনি দিত, তেমনই সেই দলের একজন ধামা থেকে মুঠো মুঠো খই ছড়িয়ে যেত, তার মধ্যে খুচরো পয়সা। যত বেশি বড়লোক, তত পয়সাও বেশি। সেই পয়সা কুড়োবার জন্যে হন্যে হয়ে থাকত একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ফুটপাতের যারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের বলে কাঙালি, বস্তির বাচ্চারা তাদের চেয়ে একটু উঁচুতে, এই দু দলেরই অধিকার ছিল পয়সা কুড়োবার। আমরা তো ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে আমাদের ওসব করতে নেই। লোভ যে হত না তা নয়, রাস্তা দিয়ে সে রকম কোনও শবযাত্রার মিছিল যাচ্ছে, গড়ানো পয়সাগুলোর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থেকেছি, অন্য ছেলেরা এসে টপাটপ কুড়িয়ে নিয়েছে। কোনও কাঙালি ছেলের হাতে এক মুঠো পয়সা দেখে কী ঈর্ষা যে হত! কিন্তু জ্ঞান উন্মেষের পর থেকেই জানতাম, কাঙালি বা বস্তির ছেলেদের চেয়ে আমরা আলাদা, আমাদের দুবেলা খাওয়া জুটুক বা না জুটুক, পরিস্কার জামা পরে রাস্তায় বেরোতে হবে। কাঙালিদের মতন শবযাত্রায় পয়সা কুড়োলে, চেনাশোনা কেউ দেখলে বাড়িতে বলে দেবেই, তারপর গুরুজনদের কেউ মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে। ... একদিন গ্রে

স্ট্রিট এ হরি ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, খুব বড় একটা শব মিছিল যাচ্ছে,... শব-মিছিলটি চলে গেলে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, রাস্তার পাশের ময়লা জলে চকচক করছে সাদা মতন কী যেন, একটা সিকি? কাঙালিরা ওটা দেখতে পায়নি। ... এক সিকিতে অন্তত আটখানা ঘুড়ি, ষোলোখানা বেগুনি, চারখানা আইসক্রিম, অন্তত পাঁচটা বুড়ির মাথার পাকা চুল, পাঁচটা খাতা আরও কত কী। এদিক ওদিক তাকিয়ে টপ করে তুলে নিলাম সিকিটা। যতদূর মনে পড়ে আমার জীবনে সেটাই প্রথম স্বাধীন উপার্জন।"[২] এই বিবৃতি সুনীলের জীবনের বাস্তব সত্যকে চিনিয়ে দেয়। শৈশবের বহু না পাওয়াই তাঁকে চিনিয়েছিল লড়াই করে বড় হওয়ার পথ, গড়ে তুলেছিল পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে, যেকারণেই তিনি তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ভূমিকে।

ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে জন্ম হওয়ায় শৈশবেই সুনীলকে পোহাতে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগের মত বিপর্যয়। জীবনের এ সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে ওঠার আতুড়ঘর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের ওপর বড়সড় আঘাত হেনেছিল। একে একে বন্ধ হয়েছিল বহু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। পরিস্থিতির বিপাকে চাকরি হারাতে হয়েছিল সুনীলের পিতাকে। অসহায় অবস্থায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি পাঠিয়ে দেন স্ত্রী ও সন্তানদের তাঁর পিতৃভূমি মাইজপাড়া গ্রামে। এখানেই সুনীলের প্রথম নিবিড় পরিচয় পল্লীবাংলার সঙ্গে। সুনীল জানিয়েছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম শিকার আমার বাবা। স্কুল কলেজ-বন্ধ হয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য, বে-সরকারি স্কুলে ছাত্রদের মাইনে থেকেই শিক্ষকদের বেতন হয়। স্কুল বন্ধ, বাবা বেকার হয়ে গেলেন, তখন আর সংসার চালাবেন কী করে, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে। সেবারে আমি মাইজপাড়া

গ্রামের বীরমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হই।”[৩] সে সময়ে কালোবাজারিদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে চাল অগ্নিমূল্য হলে, দুমুঠো ভাতের সংস্থানও হয়নি এই পরিবারের, শুধু আলুসেদ্ধ খেয়েই কাটাতে হয়েছিল বহুদিন। “গ্রামে যুদ্ধের কোনও রেশ নেই, কামান বন্দুকের শব্দ দূরে থাক, এখানকার আকাশ দিয়ে কোনও বিমানও উড়ে যায় না। তবু যুদ্ধের ধাক্কা লাগে এই নিস্তরঙ্গ গ্রামগুলিতে। প্রথম আঘাত হানে রান্নাঘরে। ... ক্রমে চাল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।”[৪] প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার অপর্ণা সেনকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে সুনীল জানিয়েছেন, এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতেই তাঁর একটানা অনেকগুলো দিন গ্রামে থাকার সুযোগ হয়েছিল, বলেছেন, “সেই সময়েই সাঁতার শিখি, গ্রামের গাছগুলো গ্রামের মানুষদের চিনতে শিখি।”[৫] আসলে খাদ্যশস্যের প্রকৃত অভাবকে বলে দুর্ভিক্ষ। পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে সেই তেতাল্লিশ সালে খাদ্যশস্য ছিল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সরকার ও কালোবাজারিরা তার অনেকখানিই সরিয়ে রেখেছিল, সেই জন্যেই খোলা বাজারের চালের এমন আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, তা চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দেশে চাল আছে, তবু দেশের মানুষ অনাহারে ধুঁকছে। সুনীল লিখেছেন, “দিনের পর দিন এই রকম, এক এক রাতে আমরা ধোওয়া ওঠা গরম ভাতের স্বপ্ন দেখি। মনে হয় যেন এ জীবনে আর ভাত খাওয়া হবে না। সহপাঠীদের মধ্যে যে দু’চারজনের বাড়িতে ভাত রান্না হয়, তাদের মুখে আমরা ভাতের গল্প শুনি। হেডমাস্টারের ছেলেটি সেইরকম একজন সৌভাগ্যবান, সে অবজ্ঞার সঙ্গে একদিন বলল, তার একথালা ভাতের ওপর একটা আরশোলা এসে পড়েছিল বলে সে পুরো ভাতটা বাড়ির কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই কুকুরটির প্রতি আমাদের ইর্ষা হয়। এ কাহিনী শোনাবার সময় সেই লস্কর-নন্দন জামার পকেট থেকে একটি মূল্যবান লাঠি লজেন্স বার করে দেখিয়ে দেখিয়ে চোষে।”[৬] এসব বিবৃতি থেকে চিনে নেওয়া

যায় সময়ের স্বরূপ তথা সাহিত্যিক সুনীলের গড়ে ওঠার কালপর্বকে। আসলে চল্লিশের দশক বাংলায় মৃত্যুর দশক। বহু মৃত্যু, বহু হানাহানির দশক। যাঁরা সেই মৃত্যুর দশক পার হয়ে বেঁচেছিলেন, তাঁরা বেঁচেছিলেন বহু হত্যার পটভূমিকায়। এহেন জটিল জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সুনীল শৈশব থেকেই সম্যক পরিচিত হয়েছিলেন জীবনের বহুমাত্রিক রূপের সঙ্গে, প্রতিনিয়ত জগৎ ও জীবনকে চেনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ভিত্তিভূমি।

খুব কম বয়স থেকেই মায়ের কাছ থেকে সুনীল পেয়েছিলেন বই পড়ার দুরন্ত অভ্যাস। 'বঙ্কিম রচনাবলী' পড়েছিলেন দশ এগারো বছর বয়সে, 'শেষের কবিতা' ক্লাস সেভেনে, প্রথম ইংরাজি উপন্যাস পড়েছিলেন অস্কার অয়াল্ডের 'Picture of Dorian Gray'। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্তকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমি বই যেখানে পেতাম পড়তাম, মামাবাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল। সেখান থেকে বই নিয়ে পড়তাম।... মায়ের ছিল ভীষণ পড়ার নেশা। লাইব্রেরি থেকে তাঁর জন্য বই আনতে হত। বয়েজ ওন লাইব্রেরি নামে উত্তর কলকাতায় একটা বিখ্যাত লাইব্রেরি আছে। সেখান থেকে বই আনতাম রোজ দুখানা। মা দুটোই একদিনে শেষ করে ফেলতেন। আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে বইগুলো পড়তে শুরু করলাম।"[৭]

১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত তাঁদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। দেশভাগের মুহূর্তেই পূর্ববঙ্গের বিশাল পরিবার এসে পড়েছিল তাঁর পিতার ওপর। সুনীল লিখেছেন, "দেশ স্বাধীন হল, আমরা দেশ হারালাম।... দেশবিভাগ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে, আমি আর সে জঞ্জাল বাড়াতে চাই না। তবে সেই প্রসঙ্গ উঠলে এখনও ক্রোধবহ্নি জ্বলে ওঠে, সেই দুষ্কর্মের হোতাদের ক্ষমা করতে পারি না। সেই সময় যে-

সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও অসূয়া তৈরি হয়েছিল, তাতে ভারত বিভাগ হয়ত অবধারিত ছিল। কিন্তু যাতে কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যত জীবনের দিশা বদলে যাবে, সেই কাজ কি অত দ্রুততার সঙ্গে করা যায়?”[৮] শুরু হয়েছিল চরম অনটন ও দারিদ্র। বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার সামান্য উপার্জনে তাঁর বাবা নিজের সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যেতেন, তার ওপর এত সব দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ায় তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন, উপার্জন বাড়াবার জন্যে পাগলের মতন টিউশানি করতেন। তবে সুনীল জানিয়েছেন, সেই দারিদ্রের কোনও তিক্ত স্মৃতি তাঁর ছিল না। দেশের এই স্বাধীনতা কিশোর জীবনেই তাঁদের দিয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ, দিয়েছিল বাড়ির বাইরে একা একা ঘুরে বেড়াবার সুযোগ। বাবা রাত সাড়ে দশটার আগে বাড়ি ফিরতেন না, মা অতিথি ও ছোটো ভাই-বোনেদের নিয়ে ব্যস্ত, সুতরাং শাসন করার মতো কেউ ছিল না। সেই বয়েসেই সন্ধ্যেবেলা পড়ায় ফাঁকি দিয়ে শহরের অলিগলি ঘুরে বাড়িয়ে ফেলেছিলেন নিজের চেনা জগতের পরিধি।

স্কুল জীবনেই সুনীল গড়ে ছিলেন ‘মণিমেলা’ নামে একটি দল। সেসময়ে আনন্দবাজারের প্রধান প্রতিযোগী ছিল ‘দৈনিক যুগান্তর’। সেই পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠা ছোটোদের জন্যে বরাদ্দ ছিল। তার সম্পাদক অখিল নিয়োগী ওরফে স্বপন বুড়ো, তাঁর নেতৃত্বে ‘সব পেয়েছির আসর’ নামে একটি দল গড়ে উঠেছিল, তারও অনেক শাখা ছিল। সুনীলদের ‘মণিমেলা’ ছিল এরই শাখা। নিছক স্কুল কলেজের গণ্ডির বাইরে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অল্প বয়সি ছেলে মেয়েদের পক্ষে বেশ উপকারী ছিল। স্কুল জীবনে সুনীল বয়েজ স্কাউটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরুজনদের সঙ্গ ছাড়া ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও দারিদ্র কোনোদিনই পিছু ছাড়েনি তাঁদের। স্কুল জীবনের শেষপ্রান্তে চোদ্দো বছর বয়েসে টিউশনি

শুরু করতে হয়েছিল তাঁকে। শৈশব কৈশোরে পাওয়া এই টুকরো টুকরো স্বাধীনতাগুলোই তাঁকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

১৯৫০ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন, ১৯৫১ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছেড়ে দমদমের মতিঝিল কলেজে আই. এস. সি তে ভর্তি হন। এই বছরেই তাঁর প্রথম কবিতা একটি চিঠি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা রচনার ইতিহাস সত্যিই খুব মধুর। 'অর্ধেক জীবন'-এ তিনি লিখেছেন, "বয়েসে আমার থেকে মাত্র এক বছরের ছোটো, অপর্ণা সেই বয়েসেই পাগলের মতন কবিতা পড়ে। মাঝে মাঝেই সে এমন সব কবিতার লাইন বলত, যা আমার অজানা। কখনও রবীন্দ্রনাথ থেকে দু'পঙক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে জিজ্ঞেস করত, এর পরে কী বলো তো? আমি হেরে যেতাম প্রায়ই। অপর্ণা যদি খেলোয়াড়দের ভক্ত হত, আমি নিশ্চিত খেলায় মন দিতাম, যদি গায়কদের পছন্দ করত, আমি গলা সাধতাম, তাকে খুশি করার একমাত্র উপায় নতুন কোনও কবিতা মুখস্ত বলা, তাই আমার কবিতা পাঠ শুরু হল নতুন উদ্যমে।... একদিন লিখে ফেললাম একখানা প্রেমের কবিতার মতন কিছু একটা, কোনও নারীর প্রতি স্বগতোক্তি বা চিঠি। অবশ্যই অপর্ণা নাম্নী সেই কিশোরীর উদ্দেশ্যে।... ওদের বাড়িতে 'দেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখেছি। সেই পত্রিকায় গদ্য রচনাগুলির তলায় মাপ মতন পদ্য ছাপা হয়, অপর্ণা সেগুলিও পড়ে।... পত্রিকাটির ঠিকানা দেখে একদিন খামে ভরে পাঠিয়ে দিলাম আমার সেই কবিতাটি, নাম দিলাম 'একটি চিঠি'।"[৯]

১৯৫২ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন সিটি কলেজে। ১৯৫৩ সালে রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'ইদানীং' পত্রিকায় 'বাঘ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবনের দ্বিতীয় কবিতা 'অগ্রণী' পত্রিকায় এবং তৃতীয় কবিতা 'শতভিষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় চতুর্থ কবিতা 'তুমি'

প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্য চর্চা নতুন মোড় নেয়। এই কবিতাটি আবু সয়ীদ আইয়ুব সংকলিত ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’ সংকলনে স্থান পায়। এই সময়ে সংসারের দায় নিতে তাঁকে মুদির দোকানে হিসেব রাখার কাজ নিতে হয়েছিল। প্রথমে দীপক মজুমদারের সঙ্গে একসঙ্গে কবিতার বই করতে চেয়েছিলেন। সিগনেট প্রেস থেকে এই কবিতার বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সাক্ষাৎ করেছিলেন ডি. কে. গুপ্তের সঙ্গে। ‘অর্ধেক জীবন’-এ সুনীল লিখেছেন, “দীপক আমাদের দ্বৈত কাব্যগ্রন্থ ছাপার প্রস্তাব জানিয়ে, সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে মলাট আঁকতে প্রায় রাজি করে ফেলেছে, তা উল্লেখ করতেও দ্বিধা করল না। ডি কে এ-প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন না। তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন না, বরং প্রশ্ন করতে লাগলেন,... আলোচনার মধ্যপথে ডি কে বললেন, আপনারা কবিতার বই ছাপবেন তার এত ব্যস্ততা কীসের? তার চেয়ে একটা কাজ করুন না, আপনাদের বন্ধুবান্ধব, সমসাময়িক কবিদের অনেকের লেখা একসঙ্গে ছাপুন,... বাংলা কবিতার তারুণ্যের ধারাটি অনুধাবন করার আর কী উপায় আছে? অর্থাৎ নতুন একটি কবিতার পত্রিকা, যাতে শুধু তরুণ বয়স্কদের রচনা মুদ্রিত হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি, কিছু আলোচনার পর নামও ঠিক হয়ে গেল, ‘কৃত্তিবাস’। ডি কে বললেন, বাংলা কবিতার আদি কবিদের মধ্যে প্রধান, কৃত্তিবাস, তাঁর নামের পত্রিকায় থাকবে অতি সাম্প্রতিক কবিতা, অর্থাৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হবে আধুনিকতা। তিনিই প্রেস ঠিক করে দিলেন, পরদিন থেকেই আমরা মেতে উঠলাম রচনা সংগ্রহের কাজে।”[১০] ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬০। এই ডি কে গুপ্তের প্রস্তাবেই শুরু করা হয়েছিল ‘হরবোলা’ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৪ সালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এই বছরেই ইউনেস্কোর অ্যাডাল্ট এডুকেশন স্কিমে হাবড়াতে চাকরি পান তিনি। এই কাজের সূত্রে গ্রাম জীবনের সঙ্গে, নিরক্ষর মানুষদের সাহচর্যে তাঁর এক নতুন উপলব্ধির জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল। তিনমাস

পরে চাকরি ত্যাগ করেন ও নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেনি হিসেবে চাকরি পান। সতেরো দিন বেহালায় দুঃসহ প্রশিক্ষণের চাপে আবার চাকরি ত্যাগ করেন। আবার ফিরে যেতে হয় টিউশনির জীবনে। বি এ পরীক্ষা দেবার পর, সাড়ে তিন মাস বাদ দিয়ে, টানা পাঁচ বছর বেকার ছিলেন তিনি। এই দীর্ঘ বেকারত্ব, টিউশনি নির্ভরতা জীবনের বহুমুখীতার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে করণিকের চাকরি পান তিনি। আর্থিক অনটন সামলাতে সন্ধ্যায় 'জনসেবক' পত্রিকায় পার্ট টাইমও নিতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কবিতার বই, 'একা এবং কয়েকজন'। ১৯৬১ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়।

১৯৬৩ সালে আমেরিকার আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রণে এবং বৃত্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায় যোগদান করার সুযোগ পান, তাঁর জীবনের একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। মার্গারিট নামে এক ফরাসি যুবতীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই সম্পর্ক পরিণতি না পেলেও সুনীল জানিয়েছেন, "জীবনে যে কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আমাকে কিছু না কিছু দিয়ে গেছে। মার্গারিটও তাদেরই একজন। সে আমাকে প্রথমবার অয়াপোনিয়ার-এর কবিতা পড়িয়েছিল। আমি পড়ে ভাবলাম 'এ কী? এমন কবিতাও লেখা হয়েছে?' সেই প্রভাব আমার ভিতরে থেকেই গেছিল।"[১১] ১৯৬৪ সালে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে ইংল্যান্ড ভ্রমণের সুযোগ পান। টি. এস. এলিয়ট এবং স্টিফেন স্পেনডারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। এই সময়েই সুইজারল্যান্ড, প্যারিস ভ্রমণ করেন, নিজের শখে রোম, কায়েরোতে থামতে থামতে ফিরলেন কলকাতায় এই বছরেই পকেটে দশ টাকা নিয়ে। বিশিষ্ট চলচিত্রকার অপর্ণা সেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, "তখনকার দিনে 'রাউন্ড

দ্য ওয়ার্ল্ড' বলে একটা এয়ার টিকিট পাওয়া যেত। সেটা কাটলে তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই নিয়ে যাবে।"[১২] কলকাতায় ফিরে আবার বেকারত্ব, আবার শুরু হল কঠিন জীবন সংগ্রাম।

এই সময়েই জীবিকার প্রয়োজনে নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে 'দেশ' 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনায় তিনি হাত দিলেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গদ্যসাহিত্যে তাঁর হয়ে গেল হাতেখড়ি। ১৯৬৬ সালে 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। এই বছরেই সনাতন পাঠক ছদ্মনামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনার সূচনা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর উপন্যাস 'অরণ্যের দিনরাত্রি', যা সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় চলচিত্র রূপ পেয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। পরের বছর সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় মুক্তি পায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী', সালটা ১৯৭০।

১৯৭০ সালেই তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় পান সাব এডিটরের চাকরি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে খুব নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তিনি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যেতেন সীমান্ত পেরিয়ে। দুই বাংলার মিলনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। দুই জার্মানির এক হওয়ার দিনে বার্লিন প্রাচীর ধ্বংসের (৯ নভেম্বর ১৯৮৯) সাক্ষী তিনি ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন বাদল বসু। ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম বারের জন্য 'আনন্দ পুরস্কার' পান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখা ও প্রকাশিত হয়, সেগুলি হল 'একা এবং কয়েক জন', 'জীবন যে রকম', 'অর্জুন'। এই সময় পর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল দুটি কাব্যগ্রন্থ, 'বন্দী, জেগে আছো' এবং 'আমার স্বপ্ন'। 'সেই সময়' উপন্যাসের আরম্ভ করেছিলেন এই সময়েই। ১৯৮১ তে তিনি দীর্ঘ সতেরো বছর পর বিভিন্ন বিদেশী সংগঠনের আমন্ত্রণে আইওয়া, কানাডা,

ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁদের সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বুধসন্ধ্যা'। এই বছর ইউনিনারি ট্র্যাক্টে ক্যানসার ধরা পড়েছিল। কাউকে কিছু না জানিয়ে শুধুমাত্র দুজন বন্ধুর সাহায্যে সুস্থ হওয়ার পথে হেঁটেছিলেন। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্য প্রদান করলেন বঙ্কিম পুরস্কার। এই বছর একটি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া।

১৯৮৪ সালে সুইডিশ সরকারের আমন্ত্রণে সুইডেন ভ্রমণের সুযোগ পান। ফেরার পথে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং কেনিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৮৫ সালে 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্য 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার পান। এই বছরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা 'কৃত্তিবাস' বন্ধ করে দেন। ১৯৮৬ সালে ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি কনফারেন্স-এর আমন্ত্রণে যুগোস্লাভিয়া ভ্রমণ ও ভারত উৎসবে যোগ দিতে আমেরিকার আটটি শহরে কবিতা পাঠ করেছিলেন সুনীল। তাঁর কবিতার ইংরাজি অনুবাদ পড়েন অ্যালেন গিনসবার্গ। অনুষ্ঠানগুলি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট, লস অ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফে, কোলোরাডোর বোল্ডার শহরে, শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, কলম্বাসের ওহায়ো ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়। অক্টোবর মাসে ফ্রাঙ্কফুটে ওয়ার্ড বুক ফেয়ারে যোগদান করেন। ১৯৮৭ থেকে শুরু করেন 'পূর্ব-পশ্চিম' লেখার কাজ, এই বছরেই বেলজিয়ান কবি ভ্যারনার ল্যামবারসি ফরাসি ভাষায় 'জ্বলন্ত জিরাফ' অনুবাদ করেন। ১৯৮৮ সালে ভারত উৎসবে যোগ দিতে সরকারি আমন্ত্রণে চেকোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া ভ্রমণ করেন। ফেরার পথে তুরস্ক ঘুরে ফেরেন। ১৮৮৯ সালে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' পান। এই বছরেই একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি সস্ত্রীক বাংলাদেশ যান। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতন,

এই বছর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সম্পাদক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি সফর করেন তিনি, আই. সি. সি. আর এর আমন্ত্রণে চিন ভ্রমণও করার সুযোগ পান। ১৯৯২ সালে তিনি যশোর সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে যশোর ভ্রমণ করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন শামসুর রহমান, রফিক আজাদ ও সৌমিত্র মিত্র। যশোরে সংবর্ধনা লাভ করেন। এই বছরেই সস্ত্রীক কানাডা ভ্রমণ করেন ফেরার পথে আমেরিকা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হয়ে ফেরেন। ফ্রান্সে যান সত্যজিৎ রায় উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে। এই বছর তাঁর ‘অর্জুন’ উপন্যাস ডাচ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৯৩ সালে তিনি বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সমিতির আমন্ত্রণে জাপান ভ্রমণ করেন। এই বছরেই ‘প্রথম আলো’ উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৯৪ সালে তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবণে বক্তৃতা, সাহিত্য আকাদেমির আমন্ত্রণে দিল্লিতে ‘মিট দ্য অথর’ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা। ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কোর সম্মেলনে অবজারভার হিসেবে মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। এই বছরে তিনি দ্বিতীয়বার চিন ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনে সার্ক দেশগুলোর পর্যবেক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন দশজন ভারতীয় প্রতিনিধির অন্যতম হিসেবে শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে। এই বছরেই তিনবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৯৭ সালে জাতীয় কবিতা উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এই বছরেই ‘সেই সময়’ উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ ‘দোজ ডেজ’ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক অরুণা চক্রবর্তী। এই বছরেই ‘প্রথম আলো’ও উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এপ্রিল মাসে আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স ভ্রমণ করেন, নভেম্বর মাসে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমির বাংলা

বিভাগের মুখ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জুন মাসে নেহেরু সেন্টারে সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পান তিনি। প্যারিস ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন এই বছরেই। এই বছরেই বাল্যবন্ধু ভাস্কর দত্তের সঙ্গে নবপর্যায়ে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ ও কৃত্তিবাস পুরস্কার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ১৯৯৯ সালে ট্রেনে হিমাচল প্রদেশ যাত্রা। ১৯শে মে ভারতীয় জাদুঘরে ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে 'ক্যালক্যাটা'র পরিবর্তে 'কলকাতা' করার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। এই বছর তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' পান। ২০০০ সালে কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে যোগদান করেন। কবিতা উৎসবে যোগ দিতে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এই বছরের জুলাই মাসে বঙ্গসম্মেলনে যোগদান করেন। দেশে ফিরে আবার ৪ অক্টোবর শিকাগো যাত্রা করেন। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও রচনাপাঠ করেন। ১৫ অক্টোবর স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ -এর আমন্ত্রণে লন্ডন গিয়েছিলেন তিনি। ২০০১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া রাজ্যে একটি আর্ন্তজাতিক কবি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পান তিনি। সেখানে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে বারো দিন বিভিন্ন শহরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাবার পথে নিউ ইয়র্ক এবং লসএঞ্জেলস -এর দুটি বইমেলা উদ্বোধন করেন। ২০০২ সালে তিনি জার্মানির মিউনিখ শহর থেকে আন্তর্জাতিক পুস্তক সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আমন্ত্রণ পান। এই বছরেই নভেম্বর মাসে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কানাডা যাত্রা ও টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন। কানাডার দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। ২০০৩ সালে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. পান। এই বছরেরই মার্চ মাসে 'সাহিত্য একাডেমি'র সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এপ্রিল মাসে তিনি বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে নিজের জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলেন। চির যুবক সুনীল জীবনের প্রান্তভাগে শারীরিক সমস্যার কারণে কিছুটা গৃহমুখী হয়ে পড়েছিলেন।

২০০৯ সাল নাগাদ তাঁর দ্বিতীয়বার ক্যান্সার ধরা পড়ে, এবং ২০১২ সালের ২৩ শে অক্টোবর এই চিরযুবকের লোকান্তর ঘটে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস, ছোটোগল্প, কাব্য কবিতার সঙ্গে ভ্রমনকাহিনী, কিশোর সাহিত্য রচনা করে গেছেন। পাশাপাশি নীললোহিত ছদ্মনামে বেশ কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই বহুল সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে ইতিহাসের পটভূমিকে সামনে রেখে রচিত ত্রয়ী উপন্যাস ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’-কে কেন্দ্র করে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান আমার গবেষণার বিষয়। এর বাইরে তাঁর রচিত সাহিত্য সম্ভারের পরিচয় সংক্ষেপ এখানে দেওয়া হল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে অন্যতম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ‘একা এবং কয়েকজন’ (প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৬৪), ‘আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি’ (চৈত্র ১৩৭২), ‘বন্দী, জেগে আছো’ (প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭৫), কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে ‘যুগলবন্দী’ (প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৭৯), ‘জাগরণ হেমবর্ণ’ (২৫ শে বৈশাখ ১৩৮১), ‘মন ভালো নেই’ (প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৮৩), ‘এসেছি দৈব পিকনিকে’ (শ্রাবণ ১৩৮৪), ‘হঠাৎ নীরার জন্য’ (জুলাই ১৯৭৮), ‘দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়’ (জৈষ্ঠ ১৩৮৬), ‘স্মৃতির শহর’ (কলকাতা বইমেলা ১৯৮৩), ‘প্রেমের কবিতা’ (অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯২), ‘নীরা, হারিয়ে যেও না’ (বইমেলা ১৯৮৯), ‘রাত্রির রঁদেভু’ (জানুয়ারি ১৯৯৫), ‘কেউ কথা রাখেনি’ (২১শে বইমেলা ১৯৯৫), ‘সেই মুহূর্তে নীরা’ (জানুয়ারি ১৯৯৭), ‘নীরা এবং নীরা’ (বইমেলা ২০০০) ইত্যাদি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল, ‘আত্মপ্রকাশ’ (কার্তিক ১৩৭৩), ‘যুবক যুবতীরা’ (চৈত্র ১৩৭৩), ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ (জানুয়ারি

১৯৬৮), ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ (শ্রাবণ ১৩৭৬), ‘সরল সত্য’ (নভেম্বর ১৯৬৯), ‘উত্তরাধিকার’ (ভাদ্র ১৩৭৭), ‘গভীর গোপন’ (ফেব্রুয়ারি ১৯৭১), ‘জীবন যে রকম’ (মার্চ ১৯৭১), ‘কালো রাস্তা সাদা বাড়ি’ (মে ১৯৭১) ‘অর্জুন’ (অক্টোবর ১৯৭১), ‘অচেনা মানুষ’ (মাঘ ১৩৭৮), ‘একা এবং কয়েকজন’ (১ বৈশাখ ১৩৮১), ‘সত্যের আড়ালে’ (জন্মাষ্টমী ১৩৮১), ‘সংসারে এক সন্ন্যাসী’ (১ বৈশাখ ১৩৮২), ‘পায়ের তলার মাটি’ (মে ১৯৭৮), ‘সেই দিন সেই রাত্রি’ (ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৮৫), ‘জল জঙ্গলের কাব্য’ (দোলপূর্ণিমা ১৩৮৭), ‘সেই সময়’ (১ম খণ্ড) (১ বৈশাখ ১৩৮৮), ‘সেই সময়’ (২য় খণ্ড) (১ বৈশাখ ১৩৮৯), ‘অমৃতের পুত্র-কন্যা’ (নভেম্বর ১৯৮৩), ‘পূর্ব –পশ্চিম’ (১ম খণ্ড) (১ বৈশাখ) ‘পূর্ব -পশ্চিম’ (২য় খণ্ড) (জানুয়ারি ১৯৮৯), ‘জোছনাকুমারী’ (১ বৈশাখ ১৩৬৯), ‘ধূলিবসন’ (জানুয়ারি ১৯৯০), ‘প্রথম আলো’ (প্রথম পর্ব) (জানুয়ারি ১৯৯৬), ‘প্রথম আলো’ (দ্বিতীয় পর্ব) (জুলাই ১৯৯৭), ‘রাণু ও ভানু’ (জানুয়ারি ২০০১), ‘নিঃসঙ্গ সম্রাট’ (এপ্রিল ২০০৫) ইত্যাদি।

নীললোহিত হিসেবেও তিনি সৃষ্টি করেছেন বহু অবিস্মরণীয় গদ্য সম্ভার। ‘নীললোহিতের চোখের সামনে’ (আষাঢ় ১৩৭৭), ‘নীললোহিতের অন্তরঙ্গ’ (মার্চ ১৯৭১), ‘নীললোহিতের চেনা অচেনা’ (জৈষ্ঠ ১৩৭৯), ‘দৃষ্টিকোণ’ (জৈষ্ঠ ১৩৮০), ‘মায়াকাননের ফুল’ (অগ্রহায়ণ ১৩৮২), ‘সুদূর ঝর্ণার জলে’ (আগস্ট ১৯৭৬), ‘হঠাৎ দেখা’ (নভেম্বর ১৯৭৬), ‘স্বর্গের খুব কাছে’ (অক্টোবর ১৯৭৭), ‘পাঁচ রকম ভূমিকায়’ (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩), ‘নিরুদ্দেশের দেশে’ (বইমেলা ১৯৮৬), ‘নীললোহিত অমনিবাস’ (১ বৈশাখ ১৩৯৬), ‘অর্ধেক মানবী’ (পৌষ ১৩৯৬), ‘কৈশোর’ (জানুয়ারি ১৯৮৯), ‘ফুলমনি–উপাখ্যান’ (মাঘ ১৩৯৮), ‘নীললোহিতের আয়না’ (জানুয়ারি ১৯৯৪), ‘নিয়তির মুচকি হাসি’ (নভেম্বর ১৯৯৫) ইত্যাদি।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গল্পগ্রন্থ গুলি হল, ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প’ (মে ১৯৭৮), ‘কোকিল ও লরিওয়ালা’ (এপ্রিল ১৯৭৯), ‘পোষ্টমর্টেম’ (শ্রাবণ ১৩৮৫), ‘দরজায় আড়ালে’ (মার্চ ১৯৮০), ‘প্রতিশোধের একদিক’ (অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৮৭), ‘শাজাহান ও নিজস্ব বাহিনী’ (বইমেলা ১৯৮৩), ‘সপ্তকন্যার কাহিনী’ (২২ সেপ্টেম্বর), ‘প্রেমিক ও স্বামী’ (১৪ এপ্রিল ১৯৯৩), ‘দময়ন্তীর মুখ’ (জানুয়ারি ১৯৯৭) ইত্যাদি।

ভ্রমণকাহিনীর জগতেও তাঁর অবাধ বিচরণ। ‘স্বর্গ নয়’ (মাঘ ১৩৭৭), ‘মানস ভ্রমণ’ (কলকাতা বইমেলা ১৯৮০), ‘রাশিয়া ভ্রমণ’ (বৈশাখ ১৩৯১), ‘পায়ের তলায় সরষে’ (নববর্ষ ১৩৯৩), ‘ছবির দেশে কবিতার দেশে’ (জানুয়ারি ১৯৯১) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু-কিশোর সাহিত্যেও তিনি নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন অনায়াসেই। কাকাবাবুকে কেন্দ্রকরে লেখা রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি জনপ্রিয়তায় ফেলুদাকে টেক্কা দিয়েছিল। ‘ভয়ংকর সুন্দর’ (ফেব্রুয়ারী ১৯৭২), ‘সবুজ দ্বীপের রাজা’ (মে ১৯৭৮), ‘ভয়ংকর প্রতিশোধ’ (জুলাই ১৯৭৯), ‘জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ’ (অক্টোবর ১৯৭৯), ‘হাতিচোর’ (অক্টোবর ১৯৮০), ‘পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক’ (মার্চ ১৯৮১), ‘জলদস্যু’ (বৈশাখ ১৩৮৯), ‘ভূপাল রহস্য’ (১ বৈশাখ ১৩৯০), ‘জলের তলায় রাজপুরী’ (নভেম্বর ১৯৮৩), ‘নীল মানুষের কাহিনী’ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ

১। পৃ ১৫, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২। পৃ ২৩, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩। পৃ ২৭, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৪। পৃ ২৮,২৯, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৫। পৃ ৬৬, অপর্ণার আড্ডায়, পরমা, সম্পাদক অপর্ণা সেন, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ১৫ নভেম্বর ২০১২

৬। পৃ ৩১, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৭। পৃ ১২, মল্লিকার সঙ্গে একান্তে ৫৯ মিনিট, আরম্ভ, সম্পাদক লালন বাহার, বর্ষ ১, সংখ্যা ৮, নভেম্বর ২০১২,

৮। পৃ ৮৩, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৯। পৃ ১১০, ১১১, ১১২, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১০। পৃ ১৪০, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১১। পৃ ৬৯, অপর্ণার আড্ডায়, পরমা, সম্পাদক অপর্ণা সেন, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ১৫ নভেম্বর ২০১২

১২। পৃ ৭০, অপর্ণার আড্ডায়, পরমা, সম্পাদক অপর্ণা সেন, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ১৫ নভেম্বর ২০১২